ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কতটা নিরাপদ?-১

এম ভি রামানা ও আশ্বিন কুমার

[গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড (এইআরবি) ও বাংলাদেশের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি অথরিটির (বিএইআরএ) মধ্যে 'পরমাণু নিরাপত্তা ও তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে কারিগরি তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা' সংক্রান্ত চুক্তি, 'আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা' বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিএইআরসি) ও ভারতের গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপের (জিসিএনইপি) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যে দেশটি বাংলাদেশের পরমাণু নিরাপত্তায় কারিগরি সহযোগিতা করবে, এমনকি বাংলাদেশের পরমাণুকর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে, সে দেশের পরমাণু নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী, পরমাণু নিরাপত্তার কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সে দেশে কতটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় থাকে তা খতিয়ে দেখার জন্য 'Safety First? Kaiga and Other Nuclear Stories' লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। লেখাটি আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ : যত অত্যাধুনিক ও নিরাপদতম প্রযুক্তির কথাই বলা হোক না কেন, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে সাধারণ ভাল্ব, বিয়ারিং, পাইপলাইন, বৈদ্যুতিক তার, পাম্প, সেন্সর ইত্যাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে এবং সামান্য অবহেলা ও অব্যবস্থাপনাও যে মারাত্মক সব বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে–এই লেখাটি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে লেখাটি বাংলাদেশের মতো দেশে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে নতুন করে ভাবাবে। ভারতের ইকোনমিক ও পলিটিক্যাল উইকলি ম্যাগাজিনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত এই লেখাটি সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন কল্লোল মোস্তফা]

সূচনা: ২৯ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড (এইআরবি) একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

'গত ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে কাইগা জেনারেটিং স্টেশন (কেজিএস) এর কিছু কর্মীর শরীরে ট্রিটিয়াম প্রবেশের ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীদের মূত্র পরীক্ষার সময় বিষয়টি ধরা পড়ে। ভারী পানি ব্যবহার করা হয় এ রকম সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেই নিয়মিত এই পরীক্ষা করা হয়...। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত সকল কর্মীদের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যাদের শরীরে ট্রিটিয়াম পাওয়া গেছে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে...। এভাবে এখন পর্যন্ত মাত্র দুইজন কর্মী সনাক্ত হয়েছে যাদের শরীরে ট্রিটিয়াম এমন মাত্রায় রয়েছে যার কারণে বার্ষিক তেজস্ক্রিয়তা দূষণের মাত্রা এইআরবি কর্তৃক নির্ধারিত ৩০ মিলিসিভার্টকে কিছুটা অতিক্রম করে যেতে পারে।'

এরপর এই ঘটনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পরমাণু কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটির গুরুত্ব খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। পুরোপুরি স্বাধীন নয় এ রকম নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সাধারণত যা করে, এইআরবিও তা-ই করেছে; সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটির সমাপ্তি টেনেছে এই বলে যে 'আমরা সকলকে আশ্বস্ত করছি, ঘটনাটি পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কার কিছু নেই।' নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনপিসিআইএল) চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস কে জৈন আশ্বস্ত করেন, 'এনপিসিআইএলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব উঁচু মানের এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সীমা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।' এমনকি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও জনগণের আশঙ্কা দূর করার জন্য ঘটনাটিকে 'ছোট আকারের একটি দূষণ' বলে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন যে 'দুশ্চিন্তার কিছুই নেই'।

কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি (ডিএই) এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা দ্বারা পরিচালিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অনেক গাফিলতির ইতিহাস রয়েছে। এই দুর্বল পরিচালনার ইতিহাস দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। ডিএই পরিচালিত বহু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ও অন্যান্য নিউক্লিয়ার জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মাত্রার দুর্ঘটনা ঘটেছে।[১] এই দুর্ঘটনাগুলোর কোনোটি থেকেই বড় আকারের তেজস্ক্রিয় দূষণের ঘটনা ঘটেনি বলে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। নিরাপত্তা বিষয়ক তাত্ত্বিকগণ অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, দুর্ঘটনার অনুপস্থিতিকে ঝুঁকির অনুপস্থিতি হিসেবে দেখা যায় না এবং কোনো প্রক্রিয়ায় অতীতে মারাত্মক দুর্ঘটনা না ঘটলেও ভবিষ্যতে যে ঘটবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।[২]

ডিএইর স্থাপনাগুলো আসলে কতটা নিরাপদ তা বুঝতে হলে এগুলোর পরিচালন কার্যক্রমকে আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এখানে বর্ণিত দুর্ঘটনাগুলো থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় ডিএই নিউক্লিয়ার নিরাপত্তাকে কতটা গুরুত্ব দেয়। পারমাণবিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানে ডিএইর কী ধরনের ঘাটতি রয়েছে নিম্নে বর্ণিত দুর্ঘটনার বিবরণ থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে।[৩] তা ছাড়া এখানে উপস্থাপিত নজিরগুলো থেকে বোঝা যাবে বিপজ্জনক প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনার কোনো সক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানটির নেই।

দুর্ঘটনার আংশিক ইতিহাস

২৪ নভেম্বর ২০০৯ এর কাইগা দুর্ঘটনাই একমাত্র ঘটনা নয়, যখন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীরা ট্রিটিয়াম মিশ্রিত তেজস্ক্রিয় পানি থেকে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছেন। ট্রিটিয়াম মিশ্রিত তেজস্ক্রিয় পানি ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হওয়ার আরো অনেক নজির রয়েছে। এসব ঘটনা থেকে পারমাণবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং কর্মী নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে আমরা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত অসংখ্য দুর্ঘটনা থেকে সামান্য কয়েকটি তুলে ধরছি।[৫] এর বাইরেও আরো বহু দুর্ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে জনগণকে একেবারেই জানতে দেয়া হয়নি।

কালপক্কম ১৯৯৯

মার্চ ১৯৯৯। মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (এমএপিএস) এর কয়েকজন কর্মী বিএআরসিসিআইএস (ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার চ্যানেল ইন্সপেকশন সিস্টেম) নামের একটি যন্ত্র পরীক্ষা করছিলেন। পারমাণবিক চুল্লির শীতলীকরণ টিউবে কোনো ফাটল রয়েছে কি না কিংবা কম্পনের কারণে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় (রেথিনারাজ ১৯৯৯)। পরীক্ষার সময় হঠাৎ করে শীতলীকরণ চ্যানেলের একটি প্লাগ পিছলে বেরিয়ে আসে। এই চ্যানেল দিয়ে পারমাণবিক চুল্লির তাপ অপসারণের জন্য ব্যবহৃত ভারী পানি প্রবাহিত হয়। প্লাগ পিছলে বেরিয়ে আসায় সেই তেজস্ক্রিয় ভারী পানি বিপুল পরিমাণে লিক করে। জানা যায়, এই ভারী পানি মোছা ও পুনরুদ্ধার

কাজে মোট ৪২ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয় (সুব্রামনিয়ান ১৯৯৯)। এর আগে মার্চ ১৯৯১ সালে এই কেন্দ্রে এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণ পানি লিক করার একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা পরিষ্কার করতে চার দিন সময় লেগেছিল (বিএআরসি ১৯৯২)।

১৯৯৯ সালের এই ঘটনার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা হিসাব করার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে দেয়া যায়, প্রতি ঘণ্টার কাজের জন্য কর্মীরা ৬ থেকে ৮ মিলিসিভার্ট তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছেন (রামানা ১৯৯৯)। এমনকি তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কমিয়ে ধরলেও ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করা একজন কর্মী নিশ্চিতভাবেই তেজস্ক্রিয়তার বার্ষিক সীমা ৩০ মিলিসিভার্টের চেয়ে বেশি মাত্রার শিকার হয়েছেন।

ঘটনাটির কয়েক সপ্তাহ পর ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা জানান, পানি পরিষ্কারের কাজে যুক্ত কর্মীদের মধ্য থেকে সাতজনকে 'প্রত্যাহার ক্যাটাগরি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে ভবিষ্যতে কোনো তেজস্ক্রিয় এলাকায় কাজ করতে দেয়া হবে না (রাধাকৃষ্ণান ১৯৯৯)। এ থেকেও বোঝা যায় যে ওই কর্মীরা বার্ষিক কোটার চেয়ে বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাদবাকি কর্মীদের 'সতর্কতামূলক ক্যাটাগরি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার অর্থ এই কর্মীরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু কোনো তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হতে পারবেন না।

এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। ২০ নভেম্বর ২০০১ এ নারোরা-১ নামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১.৪ টন তেজস্ক্রিয় ভারী পানি লিক হয়। পানি মোছার কাজে নিয়োজিত একজন কর্মী তখন ১৮ মিলিসিভার্ট মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হন বলে জানায় এইআরবি (এইআরবি ২০০২ : ১৮)। ডিএই পরিচালিত পারমাণবিক চুল্লিতে তেজস্ক্রিয় ভারী পানি লিক হওয়ার এ রকম আরো অসংখ্য দুর্ঘটনার নজির রয়েছে (ঘোষ ১৯৯৬; আইইএ ১৯৯৮ : ৩০১-২০, এইআরবি ২০০১ : ১৩, ২০০৪)।

কালপক্কম ২০০৩

২১ জানুয়ারি ২০০৩। কালপক্কম অ্যাটমিক রিপ্রসেসিং প্লান্ট (কেএআরপি) এর কয়েকজন কর্মী প্লান্টটির ওয়েস্ট ট্যাংক ফার্ম (ডাবিউটিএফ) থেকে নিম্নমাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংগ্রহের কাজ করছিলেন। এদিকে একটি ভাল্ব নষ্ট হয়ে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য যে ট্যাংকটিতে এসে জমা হয়েছে তা তাঁদের জানা ছিল না। কেন্দ্রটির বয়স ৫ বছর হলেও নষ্ট ভাল্ব শনাক্তকরণ কিংবা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পর্যবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে ছিল না। সংগৃহীত বর্জ্যের নমুনা প্রক্রিয়ার পরই কেবল জানা যায় দুর্ঘটনাটির কথা। ততক্ষণে ছয়জন কর্মী উঁচু মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়ে গেছেন (আনন্দ ২০০৩)।

যথাযথ পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি ছাড়াও বড় উদ্বেগের বিষয় হলো বিএআরসি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়ার ধরন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি কমিটি কর্তৃক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বিএআরসি কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালিয়ে যেতে থাকে। বিএআরসি ফ্যাসিলিটিজ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (বিএফইএ) পরিচালকের কাছে ১০ দফা দাবি জানিয়ে একটি চিঠি দেয়, যার মধ্যে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা অফিসার নিয়োগের দাবিও ছিল। এ ছাড়া চিঠিতে এর আগের দুই বছরে ঘটে যাওয়া আরো দুটি দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, যখন কর্মীরা উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছিলেন। চিঠিতে আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় কিভাবে জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে তখনও নিরাপত্তা প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। এবারও কর্তৃপক্ষের কোনো জবাব নেই। মরিয়া হয়ে এরপর কর্মী ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকে। জবাবে কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে বদলি করে দেয় এবং বাকিদেরও বদলি করে দেয়ার হুমকি দেয়। দুই দিন পর কর্মীরা কাজে ফিরে যান। এ ঘটনা দেখিয়ে বিএআরসির পরিচালক দাবি করেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে তো আর কর্মীরা কাজে ফিরে যেতেন না! একপর্যায়ে ইউনিয়ন তেজস্ক্রিয় দূষণের কথা গণমাধ্যমের কাছে ফাঁস করে দেয়।

খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে যে এই দুর্ঘটনাটি 'ভারতের ইতিহাসে তেজস্ক্রিয় দূষণের সবচেয়ে বড় ঘটনা' (আনন্দ ২০০৩)। কিন্তু তারা দাবি করে, দুর্ঘটনাটি কিছু কর্মীর অতি উৎসাহ ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই ঘটেছে (ভেঙ্কটেশ ২০০৩)। এ ছাড়াও তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশক 'থারমোলুমিনিসেন্ট ডোসিমিটার ব্যাজ' না পরার জন্যও কর্মীদেরকে দায়ী করার চেষ্টা করে তারা। অথচ এই ব্যাজের সাথে দুর্ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই; কারণ পুরোপুরি তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হওয়ার আগে এই ব্যাজ কর্মীদের সতর্ক করতে পারত না।[৬]

অন্যদিকে কর্মীদের সংগঠন বিএফইএর বক্তব্য হলো, এই দুর্ঘটনা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা নয়। বরং কাজের দ্রুত গতি এবং 'অনিরাপদ কর্মপদ্ধতি কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার' কারণে এখানে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২০০৩)। অর্থাৎ কালপক্কম বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নিরাপদে পরিচালনার ব্যাপারে কর্মী ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কোনো ঐকমত্য ছিল না।

এই ধরনের কর্মী অসন্তোষ ভারতের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সাধারণ চিত্র। কর্মী ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যকার খারাপ সম্পর্কের ইতিহাস বহু পুরনো। কর্মস্থল ও তার বাইরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিরোধের একটা বড় ক্ষেত্র। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৭ সালে উঁচু মাত্রার তেজস্ক্রিয় পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানোয় এমএপিএস কর্তৃপক্ষ পাঁচজন কর্মীকে সাসপেন্ড করে (হিন্দুস্তান টাইমস ১৯৯৭)। প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা ২৫ দিন ধর্মঘট করেন। ২০০৫ সালে আইজিসিএআরের কর্মীরা তাঁদের কতগুলো দাবি পূরণ না হলে ধর্মঘটের হুমকি দেন। দাবিগুলোর একটি ছিল এ রকম : বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কর্মীদের আবাসিক এলাকার রাস্তা চওড়া করতে হবে, যেন জরুরি পরিস্থিতিতে ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকতে না হয় (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২০০৩)। সংগঠন বিষয়ক তাত্ত্বিকগণ সারা দুনিয়ার ভালো মানের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে মাঠ গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এমন খোলামেলা ও দায়িত্বশীল পরিবেশে কাজ করেন, যেখানে ভয়ভীতি ছাড়াই তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করতে পারেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডিএইর স্থাপনাগুলোতে এমন কোনো পরিবেশের অস্তিত্ব নেই।

অস্থায়ী কর্মী

ওপরে আলোচিত কর্মীরা প্রতিকার পাওয়ার জন্য অন্তত ইউনিয়নের মাধ্যমে ধর্মঘট পালন করতে পারতেন। কিন্তু অস্থায়ী কর্মীদের অবস্থা এর চেয়ে আরো খারাপ। অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে, বিশেষ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিতদের অবস্থা নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। যেমন–রাওয়াতভাটা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের (আরএপিএস) আশপাশের গ্রামবাসীদের নির্দিষ্ট ধরনের অসুস্থতার (গারেকার এবং গারেকার ১৯৯৬) কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে এইআরবির সাবেক চেয়ারম্যান এ গোপালকৃষ্ণান লিখেছেন :

'তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে বহু গ্রামবাসীকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঠিক কতজন মানুষ তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সংস্পর্শে কতক্ষণ ছিলেন এ সম্পর্কিত কোনো তথ্যভাণ্ডার আরএপিএসের কাছে নেই। অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এ সম্পর্কে তথ্য চেয়েছি, কিন্তু কোনো দিনই পাইনি' (ডাউন টু আর্থ

১৯৯৯)।

ডিএই দাবি করে, অস্থায়ী কর্মীরা তুলনামূলক কম মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হন (মিশ্র ২০০৪); কিন্তু তাদের এই দাবির বিপরীত চিত্রই পাওয়া যায় পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর কর্মপরিবেশ সম্পর্কে তৃণমূল থেকে উঠে আসা বিভিন্ন স্বাধীন পর্যবেক্ষণ থেকে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালে বিএআরসির 'সিআইআরএস ও ধ্রুব নামের চুল্লির অযত্নে থাকা পাইপলাইন' থেকে বড় ধরনের তেজস্ক্রিয় দূষণের পর স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টের কথাই ধরা যাক (চিনাই ১৯৯২)। রিপোর্টে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়–

'মাটির ৮ ফুট গভীরে ফেটে যাওয়া পাইপলাইন পর্যন্ত একটি গর্ত খোঁড়ার কাজে ছয়জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়। এই শ্রমিকদেরকে কোনো তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধক দেয়া হয়নি এবং তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত করতে সক্ষম এ রকম কোনো ব্যাজও তাঁদের গায়ে ছিল না। ১৯৯১ সালের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর অস্থায়ী শ্রমিকরা ওই গর্তের ভেতর ৮ ঘণ্টা করে কাজ করেন। কাজ শেষে তাঁদেরকে দ্রুত গোসল করিয়ে নতুন এক সেট কাপড় পরিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তেজস্ক্রিয়তা পর্যবেক্ষণের জন্য এই শ্রমিকদের কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার কোনো প্রমাণও নেই' (চিনাই ১৯৯২)।

আরএপিএস থেকে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক–

জুলাই মাসের ২৭ তারিখ (১৯৯১)। আপগ্রেডিং প্লান্ট ভবনের কাছে এক কোনায় আপগ্রেড করার জন্য বেশ কয়েক ব্যারেল ভারী পানি রাখা। ভবনটির হোয়াইটওয়াশ বা চুনকাম করার কাজ চলছে। কাজটির জন্য একজন ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শ্রী মাধোলাল নামের একজন শ্রমিক কলে কোনো পানি না পেয়ে হোয়াইটওয়াশের কাজে ভারী পানি ব্যবহার করে ফেলেন। কাজ শেষে রঙের ব্রাশ পরিষ্কার এবং হাত-মুখ ধোয়ার কাজটিও করেন এই ভারী পানি দিয়ে... ...ঘটনাটির কথা কর্তৃপক্ষের কানে গেলে তারা বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেয়াল থেকে রঙের আবরণটি তুলে ট্রিটিয়াম অ্যানালাইসিসের জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। শ্রী মাধোলাল তৎক্ষণাৎ দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যান, পরেও যাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি (রাজস্থান পত্রিকা ১৯৯১)।

তারাপুর পারমাণবিক চুল্লির অস্থায়ী কর্মীরা প্রায়ই উঁচু মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছেন। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে তারাপুর কেন্দ্রটি সম্পর্কে বলা হতো, 'এই কেন্দ্রের কিছু কিছু এলাকা এত বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয় যে, যে কোনো ধরনের মেরামতের কাজ করতে গেলে মোটামুটি দুই সপ্তাহের তেজস্ক্রিয়তার ডোজ... ...কয়েক মিনিটে হজম করতে হতো' (বিদোয়াই ১৯৭৮ : ২৯)। (পূর্বোক্ত : ২৯)। 'এই কর্মীদের অনেকেরই তেজস্ক্রিয়তার বিপদ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা ধারণা থাকত না' এবং 'তারা তারাপুর কেন্দ্রের লে-আউট বা এখানকার কাজের ধরন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন না' (পূর্বোক্ত : ২৯)।[৭]

এ রকম আরো কাহিনীর নিদর্শন রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায়ই কর্মীদের স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে থাকে। ঘটনাগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাহিনী হিসেবেই থাকার কারণ হলো বাইরের লোকদের পক্ষে ডিএইর কর্মীদের স্বাস্থ্যের রেকর্ড দেখার কোনো সুযোগ নেই।

কর্মীদের তেজস্ক্রিয়তার শিকার হওয়ার এই সংক্ষিপ্ত ও আংশিক ইতিহাস থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার। প্রথমত, বারবারই কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে অবহেলা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন কেন্দ্রে ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ডিএইর কর্মীদের ত্যক্তবিরক্ত হওয়ার বহু কারণ রয়েছে এবং কাইগার সাম্প্রতিক ঘটনাটিকে বুঝতে হলে এ বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

সারা বিশ্বের নিরাপদে পরিচালিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হলো এসব কেন্দ্রে কারিগরি পরিচালনা ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় ব্যাকআপ বা বিকল্প থাকা। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটলেও তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে না। সেই সাথে বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়–এ রকম একটা মনোভাবও বজায় রাখা হয়, যেন সতর্কতায় কোনো শৈথিল্য দেখা না যায়। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদাই ভুলত্রুটি অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকে এবং শুধু নিজেদেরই নয়, অন্যদের ভুল থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে। এই অংশে আমরা ডিএইর স্থাপনাগুলোতে বারবার ঘটা বিপত্তিগুলোর প্রমাণ তুলে ধরব, যা থেকে অনেক সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কাইগা ১৯৯৪

> 'তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে বহু গ্রামবাসীকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঠিক কতজন মানুষ তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সংস্পর্শে কতক্ষণ ছিলেন এ সম্পর্কিত কোনো তথ্যভাণ্ডার আরএপিএসের কাছে নেই। অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এ সম্পর্কে তথ্য চেয়েছি, কিন্তু কোনো দিনই পাইনি'

কাইগা চুল্লির শ্রমিকদের বিপদ ঘটে এমনকি চুল্লি নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই। চুল্লিটির নির্মাণকাজ চলার সময় ১৯৯৪ সালের ১৩ মে চুল্লিটির ইনার কনটেইনমেন্ট ডোম ভেঙে পড়ে। ইনার কনটেইনমেন্ট ডোমের কাজ হলো দুর্ঘটনার সময় কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাতে পরিবেশে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করা। ডোমটি তৈরি সম্পন্ন হয়ে গেলেও সে সময় 'কেবল' সংযোগসহ অন্যান্য কাজ চলছিল (হাভানুর ১৯৯৪)। আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুর্ঘটনাটিকে 'ডিলেমিনেশন' নামে অভিহিত করা হয়; যদিও এই নাম থেকে প্রায় ১৩০ টন কংক্রিট ধসে পড়ার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না (সুবারু ১৯৯৮)। দুর্ঘটনাটি দিনের বেলায় এমন এক সময়ে ঘটে, যখন শ্রমিকরা সাইটে কাজ করছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মাত্র ১৪ জন শ্রমিক সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে দাবি করা হয়। অবশ্য বিশ্লেষকরা এমন কিছু বিষয় সামনে এনেছেন, যা থেকে মাত্র ১৪ জন শ্রমিক আহত হওয়ার তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়।

ধ্বসটির কারণ হিসেবে অন্তত দুটি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। প্রথম কারণটি হলো ত্রুটিপূর্ণ নকশা (পান্নেরসেলভান ১৯৯৯)। অপর কারণটি হলো যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের অভাব : ডিএইর কর্মকর্তাদের মতে, 'আলাদাভাবে সিমেন্ট এবং স্টিলের গুণগত মান পরীক্ষা করা হলেও এ থেকে নির্মিত কংক্রিট ব্লকগুলোর মানের কোনো পরীক্ষা করা হয়নি' (মোহান ১৯৯৪)। এটিকে পারমাণবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একেবারে মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাত্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়; কারণ নিয়ম হলো 'স্থাপনাগুলোকে সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে নির্মাণ করতে হবে' (এনইএ ১৯৯৩ : ৫১)। ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতিরও একটা দায় থাকতে পারে। এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির কারণে পরবর্তীতে একই ডোমের মধ্যে রঙের কৌটায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে (টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৯৯৯)। এ ছাড়াও কুসুম সোরাবা নামের এক স্থানীয় আন্দোলনকারীর

কাছে নির্মাণ শ্রমিকরা ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণকাজের সময় বহুবিধ অনিয়মের কথা প্রকাশ করেছেন।

এইআরবির সাবেক প্রধান এ বিষয়ে বলেছেন :

'কাইগার কনটেইনমেন্ট ডোমের ধ্বসে পড়াটা ছিল অনিবার্য একটা ঘটনা। এনপিসির সিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিএইকে নকশা ও ড্রইং সরবরাহকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এনপিসির প্রকৌশলীরা নকশাটি কাইগা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের হাতে তুলে দেয়ার আগে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। এইআরবিও এই নকশা যাচাই করেনি; কারণ যাচাই করার মতো কোনো প্রকৌশলী এইআরবির ছিল না। নকশার মারাত্মক ত্রুটিগুলো শনাক্ত হয়নি; যার ফলে কনটেইনমেন্ট ডোমটি ধ্বসে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে। এনপিসির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের অবহেলার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য এনপিসির রিপোর্টে নানা ধরনের তথ্যবিকৃতি ঘটনা হয়। এইসির যে সদস্যরা ডিএইর নন, তাঁরা এনপিসির রিপোর্টকে প্রত্যখ্যান করেন এবং প্রকৃত তথ্য সম্পর্কিত এইআরবির রিপোর্টটি গ্রহণ করেন' (গোপালকৃষ্ণান ১৯৯৯)।

পারমাণবিক শক্তির ইতিহাসে কাইগা ডোম ধ্বস অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে 'রিডানডেন্সি'র ওপর নির্ভর করার বিপদও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কনটেইনমেন্ট ডোম তৈরির কারণ হলো, যদি কোনো কারণে চুল্লির সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় এবং তার ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সে ক্ষেত্রে শক্তিশালী কনটেইনমেন্ট ডোমটি দুর্ঘটনা উদ্ভূত সকল চাপ সহ্য করবে এবং 'রিঅ্যাক্টর কোর' থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ধরে ('কনটেইন') রাখবে। ফলে আপাত দৃষ্টিতে এর মাধ্যমে নিরাপত্তা আরো জোরদার হয় বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু সুবারু যেমন বলেন–

'এই ধ্বসটি যদি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু থাকা অবস্থায় ঘটত, তাহলে প্রায় ৩০ মিটার উঁচু থেকে পড়া ১৩০ টন কংক্রিটের কারণে ডোমের নিচে থাকা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ রডগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ত। এর ফলে চুল্লি নিরাপদে বন্ধ করা কঠিন হয়ে যেত। কংক্রিটের বিপুল ওজনের কারণে শীতলীকরণ পাম্প ও পাইপলাইন ধ্বংস হতে পারত, যার ফলে শীতলীকরণ উপাদান হারাতে পারত কেন্দ্রটি। ফলাফলস্বরূপ নিউক্লিয়ার 'কোর' গলে গিয়ে পরিবেশে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যেতে পারত' (সুবারু ১৯৯৮)।

সৌভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার সময় চুল্লির নির্মাণকাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি এবং চুল্লির 'কোর' এ কোনো জ্বালানিও ছিল না।

নারোরা ১৯৯৩

ভারতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৩ সালের ৩১ মার্চ। ওই দিন ভোরে নারোরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের টারবাইনের দুটো ব্লেড ভেঙে যায়। ভাঙা ব্লেডগুলো অন্য ব্লেডের ভেতরে ঢুকে গিয়ে টারবাইনকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং অত্যধিক কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পনের কারণে টারবাইন শীতলীকরণের কাজে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন গ্যাসের পাইপলাইন ফেটে যায়। ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আগুন ধরে যায়। প্রায় একই সময়ে লুব্রিক্যান্ট তেলও লিক হয়ে যায়। আগুন এই তেলেও লাগে এবং গোটা টারবাইন ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের কারণে চার সেট বৈদ্যুতিক তারই নষ্ট হয়ে যায় এবং গোটা কেন্দ্রটি বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। বৈদ্যুতিক তার নষ্ট হওয়ার কারণে শীতলীকরণ প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং কর্মীরা ব্লেড নষ্ট হওয়ার ১০ মিনিটের মাথায় নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হন।

অপারেটররা দুর্ঘটনার ৩৯ সেকেন্ডের মাথায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে 'প্রাইমারি শাটডাউন সিস্টেম' কার্যকর করেন (কোলে ও অন্যান্য ২০০৬)। এতে চুল্লিটি প্রাথমিকভাবে বন্ধ হলেও পুনরায় চালু হয়ে যাওয়ার ভয়ে কয়েকজন ভবনের ছাদে উঠে ব্যাটারিচালিত আলোর মধ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভাল্ব খুলে চুল্লির জ্বালানিতে তরল বোরন মিশিয়ে দেন, যেন পারমাণবিক বিক্রিয়ার গতি কমে যায়। এই কাজটি করতে হয়েছিল কারণ চুল্লিটি প্রাথমিকভাবে বন্ধ হলেও তাপ উৎপাদন বন্ধ হয়নি। চুল্লির ফুয়েল রড বা জ্বালানি দণ্ডগুলোতে ফিশন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হয়ে উৎপন্ন উপাদানগুলো তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উদ্‌গিরণ করতে থাকে। চুল্লি চালু থাকার সময়ের তুলনায় এই তাপ (ডিকে হিট) উৎপন্ন হওয়ার হার যথেষ্ট কম হলেও চুল্লি পুরো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তাপ উৎপন্ন হওয়া চলতে থাকে। দ্রুত অপসারণ করা না হলে এই তাপের মাধ্যমে চুল্লির জ্বালানি পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে গলে যেতে পারে। কাজেই চুল্লি বন্ধ করার পরও শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হয়। এই কাজটি সম্পন্ন করতে অপারেটরদেরকে অগ্নিনির্বাপণের পানি সঞ্চালনের জন্য রাখা ডিজেল জেনারেটর চালু করতে হয়েছিল (এনইআই ১৯৯৩)।

বিদ্যুৎ সংযোগ এবং চুল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করতে ১৭ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। ধোঁয়ার কারণে যে কর্মীরা নিয়ন্ত্রণকক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ১৩ ঘণ্টা পর তাঁরা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে কেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের একটি চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষের প্রথম কন্ট্রোল ইউনিটটি ব্যবহার করা যায়নি। অর্থাৎ নারোরা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এই দিক থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম যে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অপারেটরদের কোনো ধারণাই ছিল না, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি 'অন্ধের মতো চলছিল' (নওলেন, কাজারিয়ানস ও ওয়ান্ট ২০০১)।

ডিএইএর দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে এই নারোরা দুর্ঘটনাটি একেবারে মহা বিপর্যয়ের কাছে চলে গিয়েছিল। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, এই দুর্ঘটনাটি আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল।

প্রথমত, টারবাইন ব্লেড বা পাখা নষ্ট হওয়ার ঘটনাটি এড়ানো যেত। ১৯৮৯ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি টারবাইন নির্মাতা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডকে (বিএইচইএল) নকশার একটি ত্রুটি সম্পর্কে জানায়। এই ত্রুটির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের টারবাইনের ব্লেডে ফাটল ধরেছিল। জেনারেল ইলেকট্রিক নকশা পরিবর্তনের কিছু সুপারিশ করেছিল, যে সুপারিশ অনুযায়ী বিএইচইএল এনপিসির জন্য নতুন করে বিস্তারিত নকশা তৈরি করে ব্লেডগুলো পাল্টে ফেলার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এনপিসি সময়মতো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি (গোপালকৃষ্ণান ১৯৯৯)।

দ্বিতীয়ত, এমনকি পরিবর্তন করার পরও যদি টারবাইনের ব্লেডগুলো কোনো কারণে নষ্ট হতো, তারপরও দুর্ঘটনা এড়ানো যেত–যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করত। আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক কাজ করত যদি বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ পৃথকভাবে কোনো অগ্নিরোধক পাইপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। নারোরা চুল্লি যে সময়টায় চালু হয় তার আগেই সারা দুনিয়ার নিউক্লিয়ার ডিজাইনারদের মধ্যে এই নিয়মটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন্স ফেরি দুর্ঘটনার পর থেকেই সবাই এই ব্যাপারটি মেনে চলেন (রামজে ও মোদারেস ১৯৯৮ : ১০৬)। অগ্নি প্রতিরোধের জন্য বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য কাঠামোগত নকশা পরিবর্তন করা হয়, বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৮৯ সালে নারোরা কেন্দ্র চালু হওয়ার আগেই এসব ঘটনা ঘটে। তা সত্ত্বেও নারোরা

বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারটি বিকল্প বিদ্যুৎ সংযোগই একই পাইপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার চারপাশে কোনো অগ্নিনিরোধক আবরণ ছিল না এবং বৈদ্যুতিক তারগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা রাখারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

তৃতীয়ত, ডিএইর বিভিন্ন চুল্লিতে এর আগে বিভিন্ন সময় আগুন লাগার ঘটনা ঘটার পরও ডিএইএ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৮৫ সালে আরএপিএস-২ কেন্দ্রটির একটি 'ওভারহেড কেবল' সংযোগে আগুন লেগে পুরো 'কেবল ট্রে'তে ছড়িয়ে যায় এবং চারটি পাম্প বিকল করে দেয় (আইএ ১৯৮৬ : ২৪৪; গোপালকৃষ্ণান ১৯৯৯)। এর কয়েক বছর পর ১৯৯৯ সালে ওই একই ইউনিটের বয়লার রুমে এবং আরএপিএস-১ ইউনিটের 'টার্বো জেনারেটর অয়েল সিস্টেমে' আগুন লাগে (আইইএ ১৯৯২ : ৩৯৪-৯৬)।

দুর্ঘটনার কারণগুলো নারোরা দুর্ঘটনা ঘটার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় চুল্লির 'টারবাইন বিয়ারিং' এ মাত্রাতিরিক্ত কম্পন কোনো নতুন ঘটনা নয়। ১৯৮১ সালে আরএপিএস-২ বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইন ভবনে তেল চুইয়ে পড়ার ঘটনা থেকে 'জেনারেটর এক্সাইটরে' উঁচু মাত্রায় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির ঘটনায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি দু-দুবার বন্ধ করতে হয়েছিল (আইইএ ১৯৮২ : ২৩৫)। পুনরায় চালু করার পর দেখা গেল, 'টারবাইন গভর্নিং সিস্টেম' থেকে ব্যাপক পরিমাণ তেল চুইয়ে পড়েছে। ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আবারও বন্ধ করতে হয়েছিল। ১৯৮২ সালের শুরুর দিকে তৃতীয়বার চালু করার পরই কেবল টারবাইন বিয়ারিংয়ে উঁচু মাত্রার কম্পন ও ব্লেড বিকল হওয়ার ঘটনাটি ধরা পড়ে (আইইএ ১৯৮৩ : ২৫০)। এর ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে বন্ধ থাকে; এমনকি সমস্যাটির সমাধানের পর টারবাইন বিয়ারিংয়ের বাড়তি তাপমাত্রার কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আবারও বন্ধ করে দিতে হয় (আইইএ ১৯৮৩ : ২৩০)। আবারও ১৯৮৩ সালে টারবাইন বিয়ারিংয়ে উঁচু মাত্রার কম্পন ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, উচ্চ চাপে রোটরের দ্বিতীয় স্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (আইইএ ১৯৮৪ : ২৯২)। টারবাইন জেনারেটরের উঁচু কম্পনের সমস্যার কারণে ১৯৮৫ সালে মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশনের প্রথম ইউনিটটি (এমএপিএস-১) বারবার বন্ধ করতে হয়। একই কারণে আরএপিএস-১ কেন্দ্রটি ১৯৮৫, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে বন্ধ করতে হয় (আইইএ ১৯৮৬ : ২৪২, ১৯৯০ : ৩০২, ১৯৯১ : ২৯৮)।

ভারতীয় চুল্লি থেকে তেল চুইয়ে পড়ার ঘটনাও খুব সাধারণ। ১৯৯৮ সালে জেনারেটর ট্রান্সফরমার থেকে তেল চুইয়ে পড়ার কারণে এমএপিএস-২ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে হয় (আইইএ ১৯৯০ : ২৮৮)। ১৯৮৯ সালে এমএপিএস-১ কেন্দ্রটির টারবাইনের এক্সাইটারের 'সিপ রিং' থেকে বড় আকারের স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়ে; একই চুলিতে প্রাথমিক তাপ পরিবাহী ব্যবস্থার কাছে দুটো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে (আইইএ ১৯৯০ : ২৯৮)। ১৯৮৯ সালে এমএপিএস-২ বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইন বিয়ারিং থেকে তেল চুইয়ে পড়ে (আইইএ ১৯৯০ : ৩০০)। ১৯৯২ সালে এমএপিএস-২ কেন্দ্রের 'টারবাইন স্টপ ভাল্ব' থেকে তেল চুইয়ে পড়ে। এ ছাড়া ১৯৯২ সালে নারোরা-১ বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইন জেনারেটর সিস্টেম থেকে তেল চোয়ানোর দুটো পৃথক ঘটনা ঘটে (আইইএ ১৯৯৩ : ২৮৯)। নারোরা দুর্ঘটনার আগে হাইড্রোজেন গ্যাস লিকের ঘটনা অন্তত আরো একবার ঘটেছে, আর তা ঘটেছিল ১৯৯১ সালে এমএপিএস-২ কেন্দ্রের 'জেনারেটর স্টেটর ওয়াটার সিস্টেমে' (আইইএ ১৯৯২ : ৩৯০)।

ডিএই এই সব অভিজ্ঞতা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এই অবহেলাও নারোরা দুর্ঘটনার জন্য অংশত দায়ী। পারমাণবিক চুল্লিতে বারবার টারবাইন ব্লেড নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকার গ্রহীতার প্রশ্নের জবাবে এইসি চেয়ারম্যান চিদাম্বরম বিষয়টিকে এড়ানোর জন্য বলেন, 'নারোরা বিদ্যুৎকেন্দ্রে এই ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম... ...দুটো ব্লেড নষ্ট হয়' এবং অযৌক্তিকভাবে দাবি করেন, 'আপনাকে মনে রাখতে হবে পারমাণবিক চুল্লির কথা যদি বিবেচনা করি তাহলে নারোরা কেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি। চুল্লিটি নকশা অনুযায়ী চমৎকারভাবে চলেছে' (চিদাম্বরম ১৯৯৩)। এই সব আগাম সতর্কতা অগ্রাহ্য করে ডিএই নারোরা দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

-আগামী পর্বে সমাপ্য

পাদটীকা

১) এখানে ডিএই বলতে ডিএই ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনসহ এর আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকেই বোঝানো হয়েছে।

২) কিংবা জেমস রিজন যেমন বলেছেন, 'এমনকি সবচেয়ে নাজুক সিস্টেমটিও অন্তত একবারের জন্য বিপর্যয় এড়িয়ে যেতে পারে। চান্স বা সুযোগ কোনো পক্ষ নেয় না। কখনো যোগ্যকেও পীড়িত করে আবার অযোগ্যকে টিকিয়ে রাখে' (রিজন ২০০০)।

৩) যত দূর সম্ভব, আমরা এই বর্ণনাগুলো ডিএইসহ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকাশিত নথি থেকেই সংগ্রহ করেছি। সেখানে পাওয়া না গেলে, কিংবা সহযোগী হিসেবে, আমরা গণামাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ব্যবহার করেছি। অবিশ্বাস করার মতো কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ না থাকলে আমরা এই তথ্যগুলোকে নির্ভুল হিসেবেই ধরে নিয়েছি। কোনো একটি রিপোর্টের ওপর বেশি নির্ভর না করার চেষ্টা করেছি আমরা।

৪) জৈবিকভাবে যুক্ত ট্রিটিয়াম এইচটিওর চেয়ে বেশি শক্তি সরবরাহ করে, ফলে এ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রাও বেশি হয় (চ্যান ২০০৬)।

৫) এই বর্ণনায় ইউরেনিয়াম খনি ও কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের বিষয়টি আনা হয়নি, যাঁরা র‍্যাডন গ্যাস ও তুলনামূলক উচ্চমাত্রার ধুলায় আক্রান্ত হন।

৬) এই ব্যাজগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে সম্মিলিত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করে। হেলথ ফিজিকস বিভাগে বিশ্লেষণের জন্য ব্যাজগুলোকে জমা দিতে হয়।

৭) ঝুঁকি সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা রয়েছে, তার মধ্যে একটি সমস্যা রয়েছে। ঝুঁকি পরিমাপ করার সময় বিপদের আশঙ্কাকে ততটা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয় না–সংশ্লিষ্ট প্রোব্যাবিলিটির সংখ্যাগুলো আমলে নিলে যতটা করা যেত। বরং কর্মক্ষেত্রের ওপর কর্মীর নিয়ন্ত্রণ কতটুকু, তার ওপর নির্ভর করে কাজের ঝুঁকির মাত্রা। ব্রিটিশ তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ডেইভ রোজেনফেল্ড এই উদাহরণটি দিয়েছেন : 'উইন্ডফিল্ড নিউক্লিয়ার রিপ্রসেসিং প্লান্টের একজন কর্মীকে তাঁর কাছে অচেনা একটি উচ্চ তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত এলাকায় পাইপ মেরামতের কথা বলে দেখুন। এমনকি যদি উঁচু তেজস্ক্রিয় 'হটস্পট' মাত্র অল্প কয়েকটাও হয়, তাঁর কাছে গোটা এলাকাই বিপজ্জনক মনে হবে। তাঁর কাছে একটা সোজা রেখা ধরে হেঁটে যাওয়া চোখ বন্ধ করে রাস্তা পার হওয়ার মতো। কর্তৃপক্ষ তাঁকে হটস্পটের একটা চার্ট এবং পকেট অ্যালার্ম মিটার সরবরাহ করলে তিনি হটস্পটগুলো এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন–অবশ্য যদি তিনি অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে কর্তৃপক্ষ কিংবা ইউনিয়নের নিরাপত্তা কমিটি এই চার্ট ও মিটারগুলোকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছে' (রোজেনফেল্ড ১৯৮৪ : ৪৩)।